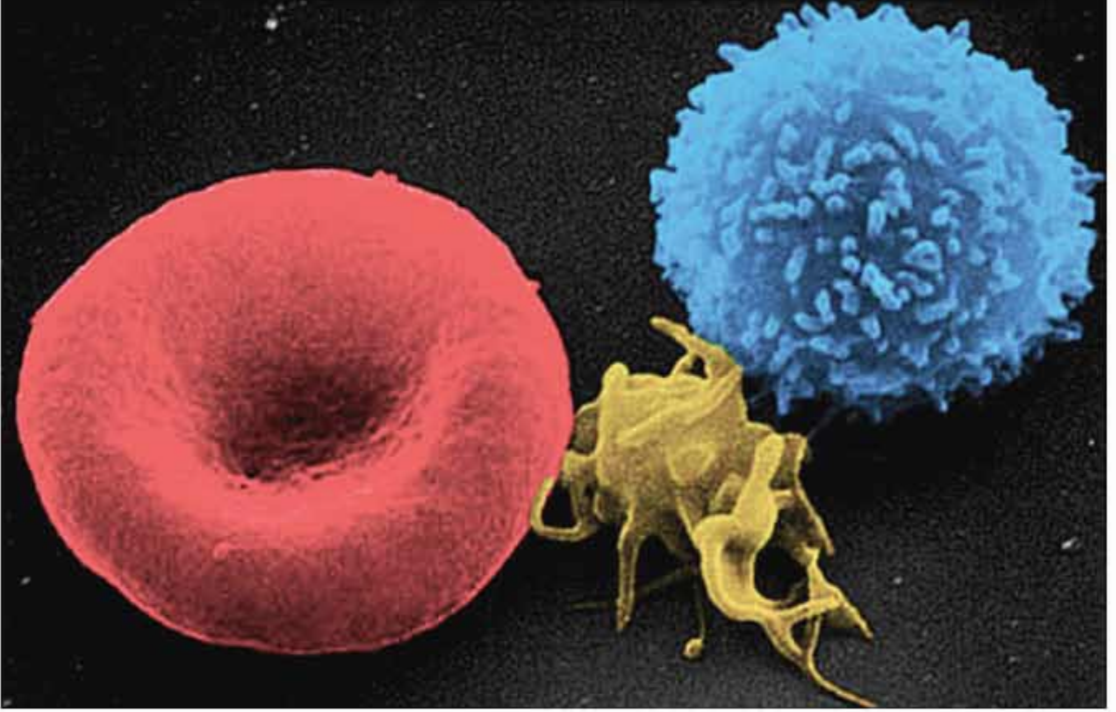


ষষ্ঠ অধ্যায় জীবে পরিবহন



পরিবহন জীবদেহের একটি অতিপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, যা সবসময়েই ঘটে চলেছে। উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পরিবহন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, খাদ্য চলাচলও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মাটি থেকে গ্রহণ করা পানি আর খনিজ সবণ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পাতায় প্রস্তুত করা খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবহনও ঠিক তেমনি সমান প্রয়োজনীয়। মানবদেহে পরিবহন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের মতো নয় কিন্তু উভয়েই পদার্থবিজ্ঞানের একই নিয়ম অনুসরণ করে।

উদ্ভিদ আর মানবদেহের পরিবহন পদ্ধতি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- উদ্ভিদে পরিবহনের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদে ও পানির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ পানি ও খনিজ পদার্থ শোষণ প্রক্রিয়া ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের ফলে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদনের ধারণা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদনের হার নিয়ন্ত্রণে প্রভাবকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রস্বেদন একটি অতিপ্রয়োজনীয় অমঞ্জল তা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদে প্রস্বেদনের পরীক্ষা করতে পারব।
- মানবদেহে সংবহনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত উপাদানের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন গ্রুপের রক্তের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত গ্রুপ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রক্ত নির্বাচন করতে পারব।
- রক্তদানের নিয়মাবলি এবং এর সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্ণনা করতে পারব।
- মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড গঠনগতভাবে যে এর কার্যক্রমের সাথে অভিযোজিত তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে রক্তচাপের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোলেস্টেরলের প্রকারভেদ, সীমা, উপকারিতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বর্ণনা করতে পারব।
- রক্ত সঞ্চালনে কোলেস্টেরলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তে অস্বাভাবিকতার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড সম্পর্কিত রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিশ্রামের অবস্থায় এবং শরীরচর্চার পর রক্তচাপ ও পালসরেট পরিমাপ করতে এবং দুই অবস্থানে পরিমাপকৃত রক্তচাপ ও পালসরেট বিশ্লেষণ করতে পারব।
- সঠিকভাবে রক্তচাপ ও পালসরেট পরিমাপ করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার জন্য নিজে সচেতন হব এবং অন্যকে সচেতন করতে পারব।

6.1 উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। আমরা জানি, প্রোটোপ্লাজম জীবদেহের ভৌত ভিত্তি, এই প্রোটোপ্লাজমের শতকরা 90 ভাগই পানি। এ কারণেই পানিকে ফ্লুইড অফ লাইফ বলা হয়ে থাকে। পানির পরিমাণ কমে গেলে প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে মরে পর্যন্ত যেতে পারে। তাছাড়া উদ্ভিদের দেহে যত বিপাকীয় বিক্রিয়া চলে, পানির অভাব হলে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। উদ্ভিদদেহে পানির প্রয়োজনীয় দিকগুলোর মধ্য উল্লেখযোগ্য হলো:

- প্রোটোপ্লাজম সজীব রাখতে পানির বিকল্প নেই। একটি সংকুচিত প্রোটোপ্লাজমযুক্ত কোষকে বাঁচাতে চাইলে দেরি না করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রস্বেদন ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে পরিমাণমতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এজন্যই শুষ্ক মৌসুমে বড় বড় উদ্ভিদেও পানি সেচ দিতে হয়।
- পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক। বিপাকীয় অনেক বিক্রিয়ায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম।
- উদ্ভিদের কোষ বৃদ্ধি ও চলনে পানির ভূমিকা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উদ্ভিদ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি কোথায় এবং কীভাবে পায়? উদ্ভিদ প্রধানত মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। উদ্ভিদে 3টি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে শোষণ কাজ সম্পাদন করে। প্রক্রিয়া তিনটি হলো ইমবাইবিশন, ব্যাপন এবং অভিস্রবণ।

(a) ইমবাইবিশন (Imbibition):

এক খন্ড শুকনা কাঠের এক প্রান্ত পানিতে ডুবালে ঐ কাঠের খন্ডটি কিছু পানি টেনে নেবে। আমরা জানি, কলয়েড জাতীয় শুকনা বা আধা শুকনা পদার্থ তরল পদার্থ শুষে নেয়, এ জন্যই কাঠের খন্ডটি পানি টেনে নিয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলে। সেলুলোজ, স্টার্চ, জিলাটিন— এগুলো হাইড্রোফিলিক (পানিপ্রিয়) পদার্থ। এরা তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে তা শুষে নেয়, আবার তরল পদার্থের অভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম কলয়েডধর্মী হওয়ায় ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে স্ফীত হয়ে ওঠে। পানি শোষণের এটি একটি অন্যতম প্রক্রিয়া।

(b) ব্যাপন (Diffusion):

ঘরের এক কোণে কিছু সুগন্ধি তেলে দিলে তার সুগন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। কারণ এর ক্ষুদ্র কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্লাস পানিতে কিছু চিনি ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাসের পানি মিষ্টি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চিনির অণু পানিতে ছড়িয়ে পুরো পানিকে মিষ্টি স্বাদযুক্ত করে তোলে। এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া (Physical process)। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের

অণু বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাকে ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে। একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের বেশি ঘনত্ববিশিষ্ট দ্রবণ থেকে কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে দ্রাবকের ব্যাপিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। একই বায়ু চাপে কোনো একটি দ্রবণ ও দ্রাবকের ব্যাপন চাপের পার্থক্যকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion pressure deficit) বলে। পাতার মেসোফিল টিস্যুতে এই ব্যাপন চাপ ঘাটতির ফলে পানির ঘাটতি আছে, এমন কোষ পাশের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। এক কথায় উদ্ভিদের পানি শোষণে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।



একক কাজ

কাজ : ব্যাপন প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ।

উপকরণ : একটি ছোট বাটি এবং আতর বা যেকোনো সুগন্ধি।

পদ্ধতি : ব্যাপন প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করতে আতর বা সুগন্ধি বাটিতে ঢেলে পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা কর।

(c) অভিস্রবণ (Osmosis):

অভিস্রবণ কী, সেটা কি তোমরা জান? তোমরা কি খেয়াল করেছ যে তোমার মা যখন পানিতে কিশমিশ ভিজিয়ে রাখেন, তার কিছুক্ষণ পর চুপসে থাকা কিশমিশগুলো ফুলে টসটসে হয়ে ওঠে। ঐ টসটসে কিশমিশ যদি আবার ঘন চিনির দ্রবণে ভিজিয়ে রাখ, তাহলে দেখবে সেগুলো আবার চুপসে গেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা ধারণা করতে পার? এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়াটি জীবন্ত কোষ ছাড়াও কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরিতেও ঘটানো যায়। যদি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ যাদের দ্রব এবং দ্রাবক একই, একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা (Selectively permeable membrane) দিয়ে আলাদা করা হয়, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে। একই দ্রব এবং দ্রাবকযুক্ত দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করা হলে, দ্রাবক তার নিম্ন ঘনত্বের দ্রবণ থেকে উচ্চ ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হয়। দ্রাবকের বৈষম্যভেদ্য পর্দা ভেদ করে তার নিম্ন ঘনত্বের দ্রবণ থেকে উচ্চ ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বলা হয়।



একক কাজ

কাজ : কোষ থেকে কোষে অভিস্রবণের পরীক্ষণ।

উপকরণ : একখণ্ড আলু, ব্লেন্ড, পেট্রিডিস, পানি, চিনি।

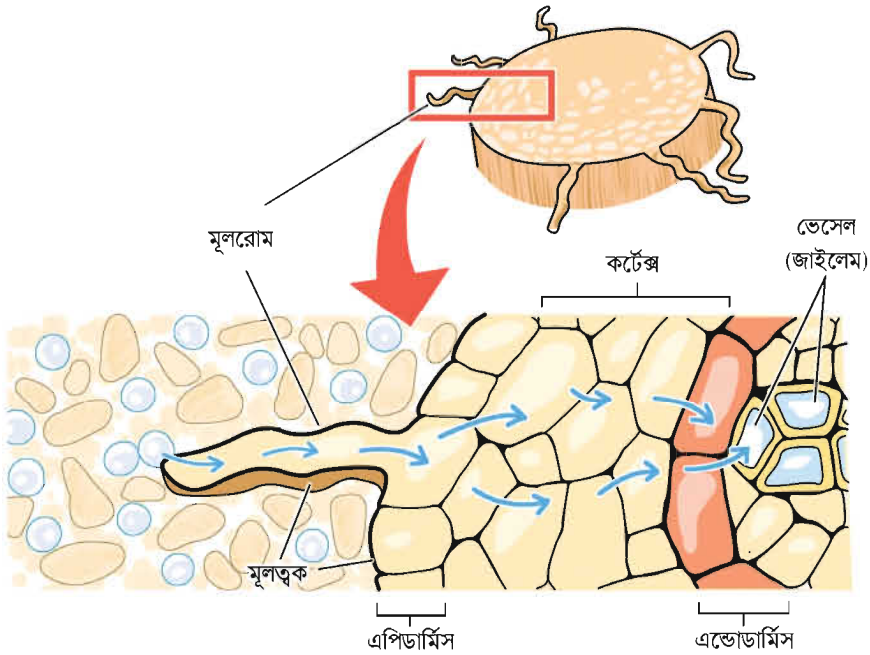
পদ্ধতি : আলু দিয়ে অসমোস্কোপ বানাও। চিনির শরবৎ ঢেলে অভিস্রবণের প্রমাণ দাও।

6.2 পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

উদ্ভিদে পানি শোষণ ও খনিজ লবণ শোষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পানি শোষণ বিষয়টি সম্পর্কে আগে জানব।

(a) পানি শোষণ:

সাধারণভাবে উদ্ভিদ তার মূলরোমের মাধ্যমে মাটির কৈশিক পানি (capillary water) শোষণ করে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার কোষে ব্যাপন চাপ ঘাটতির সৃষ্টি হয়, এর ফলে পাশের কোষ থেকে পানি এই কোষের দিকে ধাবিত হয়। একইভাবে ঐ দ্বিতীয় কোষটিতে আবার ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয় এবং তার পাশের বা নিচের কোষ থেকে পানি টেনে নেয়। এভাবে ব্যাপন চাপ ঘাটতি ক্রমশ মূলরোম পর্যন্ত



চিত্র 6.01: পানি শোষণ ও পরিবহন

বিস্তৃত হয় এবং একটি চোষক শক্তির সৃষ্টি হয়। এ চোষক শক্তির টানে মাটির কৈশিক পানি মূলরোমে ঢুকে পড়ে। মাটি থেকে মূলরোমে অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এ পানি প্রবেশ করে। এভাবে মূলরোম থেকে পানি মূলের কর্টেক্সে (Cortex) প্রবেশ করে। এ কাজটিকে কোষ থেকে কোষান্তরে অভিস্রবণ (cell to cell osmosis) পদ্ধতি বলে। একইভাবে পানি অন্তঃস্থক ও পরিচক্র হয়ে পরিবহন কলা গুচ্ছে (Vascular bundles) পৌঁছে যায়। পানি একবার পরিবহন কলায় পৌঁছে গেলে তা জাইলেম কলার মাধ্যমে উপরের দিকে এবং পাশের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে পানি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা হয়ে

উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে যায়। এ কাজে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কাজ করে সেগুলো হলো, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন।

(b) খনিজ লবণ শোষণ:

অধিকাংশ উদ্ভিদ পানির সাথে কিছু পরিমাণ খনিজ লবণ শোষণ করে, কিছু লবণ মূলরোম দিয়ে শোষিত হলেও মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসেবে। শোষণ প্রধানত দুটি উপায়ে হয়ে থাকে, নিষ্ক্রিয় শোষণ ও সক্রিয় শোষণ।

নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption): উদ্ভিদের এ প্রক্রিয়ায় মূলরোম ইমবাইবিশন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে, কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না।

সক্রিয় শোষণ (Active absorption): সক্রিয় শোষণে খনিজ লবণ পরিবহনের জন্য কোষে উৎপন্ন বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়।

6.2.1 উদ্ভিদে পরিবহন:

উদ্ভিদে পরিবহন বলতে মাটি থেকে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যের চলাচলকে বুঝায়। আমরা জানি, জাইলেম ভেসেলে মাধ্যমে পানি এবং খনিজ লবণ উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছায়। প্রস্বেদন টান, কৈশিক শক্তি এবং মূলজ চাপের ফলে কোষরস উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে যায় বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। এভাবে পাতায় পানি পৌঁছালে সেখানে খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ফ্লোয়েম টিস্যু। এ খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈব যৌগ ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে বিপরীত দিকে একই সাথে চলাচল করে। উদ্ভিদের নিচের দিকের যৌগগুলো নিচের দিকে, উপরে সংশ্লেষিত যৌগগুলো উপরের দিকে এবং উদ্ভিদের মাঝামাঝি এলাকায় সংশ্লেষিত পদার্থগুলো উপরে বা নিচে যেকোনো দিকে প্রবাহিত হয়।

উদ্ভিদে পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা:

পরিবহন অর্থ একস্থান থেকে অন্য স্থানে কোনো পদার্থের স্থানান্তর। পানি ও খনিজ লবণের চলাচলকে উদ্ভিদে পরিবহন বলা হয়। উদ্ভিদে পানি ও খনিজ দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার কথা সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। এই পানি এবং খনিজ পদার্থ উদ্ভিদের কাজে আসতে হলে সেগুলোকে অবশ্যই বিক্রিয়াস্থল নিয়ে যেতে হবে। এজন্য পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলরোম দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ শোষিত হয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কটেক্সের মধ্য দিয়ে জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায় এবং প্রস্বেদন স্রোতের সাথে ধীরে ধীরে পাতায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে খাদ্য তৈরি হয়। পাতা থেকে তৈরি খাদ্য ফ্লোয়েমের সিভনল দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। কখনো জাইলেম ভেসেল বা ফ্লোয়েমের সিভনল কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে উদ্ভিদের মৃত্যু অবধারিত। এজন্য বলা যায় পরিবহন উদ্ভিদ জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

পানি ও খনিজ পদার্থের পরিবহন (Translocation of water and minerals):

আমরা ইতোপূর্বে অভিস্রবণ ও ব্যাপন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে মূল দিয়ে পানি শোষণ করে। মূলরোমের সাহায্যে প্রধানত এ কাজটি হয়। পাশাপাশি উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ পুষ্টিও শোষণ করে। অবশ্য খনিজ পুষ্টি শোষণের পদ্ধতি পানি শোষণ পদ্ধতি থেকে আলাদা। এ বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে। কোষের ভিতরকার পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে এক্ষেত্রে কোষরস (cell sap) বলে। এবার আমরা মূল থেকে উদ্ভিদের সর্বোচ্চ শাখায় এবং পাতায় কীভাবে কোষরস পৌঁছায় তা জানব।

কোষরসের আরোহণ (Ascent of sap):

মূল পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। এ কোষরস বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে। একই সাথে কোষরসের পার্শ্ব পরিবহনও চলতে থাকে। কোষরস পরিবহনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, মাটিতে থাকা পানি ও খনিজ লবণগুলো মূলরোম থেকে মূলের পরিবহন কলায় পৌঁছানো এবং মূলের পরিবহন কলা থেকে পাতায় পৌঁছানো। প্রথম ধাপে অভিস্রবণ, ব্যাপন ও প্রস্বেদন টান ইত্যাদি পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ ও পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলরোম দিয়ে শোষিত পানি এবং খনিজ পদার্থ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোম থেকে পাশের কোষে যায়। ঐ কোষ থেকে তা পুনরায় তার পাশের কোষে যায়। এভাবে কোষ থেকে কোষে পানি এবং খনিজ পদার্থ চলতে চলতে একসময় মূলের পরিবহন টিস্যু হয়ে এবং কাণ্ডের পরিবহন কলা বেয়ে পাতার মেসোফিল কলায় পৌঁছায়।



একক কাজ

কাজ: উদ্ভিদের রস উত্তোলন পরীক্ষণ।

উপকরণ: Peperomia উদ্ভিদ, একটি বোতল, পানি ও স্যাফ্রানিন বা লাল কালি।

পদ্ধতি: একটি বোতলে কিছু পানি নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা স্যাফ্রানিন বা লাল কালি নাও। মূলসহ একটি তাজা peperomia উদ্ভিদ এমনভাবে স্থাপন কর যেন মূলগুলো পানিতে ডুবে থাকে। এ অবস্থায় বোতলটিকে কয়েক ঘণ্টার জন্য রেখে দাও এবং পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল খাতায় লেখ।



চিত্র 6.02: উদ্ভিদে রস উত্তোলন পরীক্ষা

6.2.3 সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন

তোমরা আগেই জেনেছ যে উদ্ভিদ অভিস্রবণ পদ্ধতিতে পানি গ্রহণ করে। এ পানি জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে সুউচ্চ বৃক্ষের সর্বোচ্চ স্থানের পাতায়ও পৌঁছে যায়। পাতা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ পানি ব্যবহার করে। আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টে বায়ু থেকে গৃহীত CO_2 এবং মাটি থেকে গৃহীত পানির সংমিশ্রণে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষই এ খাদ্য ব্যবহার করে শ্বসন প্রক্রিয়ায় তার বিপাকীয় কাজ চালানোর প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। এ কাজের পর যতটুকু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, সেগুলো উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সঞ্চিত থাকে। বিভিন্ন ফল এবং বীজ ছাড়াও কাণ্ড (গোল আলু), মূল (মিষ্টি আলু) কিংবা পাতাতেও (ঘৃতকুমারী) এই খাদ্য জমা থাকে। আমরা এবার দেখব সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন খাদ্য কীভাবে উদ্ভিদেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন (Phloem translocation):

উদ্ভিদের মূল এবং পাতা পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করায় খাদ্য চলাচলে একটি দ্রুত ও কার্যকর পরিবহনব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। এ কাজটি ফ্লোয়েমের সিভনল করে থাকে। ফ্লোয়েম পরিবহন কলাগুচ্ছের অন্যতম গুচ্ছ। আমরা জেনেছি যে পরিবহন কলাগুচ্ছে জাইলেমগুচ্ছ এবং ফ্লোয়েমগুচ্ছ থাকে। ফ্লোয়েমগুচ্ছে সিভনল, সঞ্জীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও বাস্টফাইবার থাকে। সিভনল এক ধরনের কেন্দ্রিকাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত সজীব কোষ। লম্বালম্বিভাবে এরা একটির সাথে অন্যটি যুক্ত হয়ে উদ্ভিদেহে জলের মতো গঠন সৃষ্টি করে। দুটো কোষের মধ্যবর্তী অনুপ্রস্থ প্রাচীরটি স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে চালুনির মতো আকার ধারণ করে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সহজেই এক কোষ থেকে অন্য কোষে চলাচল করতে পারে। শীতকালে এ রন্ধ্রগুলোতে ক্যালোজ নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয়ে রন্ধ্র ছোট হয়, তাই খাদ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। গ্রীষ্মের আগমনে ক্যালোজ গলে যায়, তাই খাদ্য চলাচল বেড়ে যায়।

6.2.4 প্রস্বেদন (Transpiration):

পানি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। উদ্ভিদ প্রধানত মূল দিয়ে তার প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে। শোষিত পানির অতি সামান্য অংশ উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির জন্য ব্যয় হয়। অবশিষ্ট পানি উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ দিয়ে বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়ে যায়। সাধারণত স্থলজ উদ্ভিদ যে শারীরতত্ত্বীয় প্রক্রিয়ায় তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি বের করে দেয়, সেটাই প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া। এ কাজটি তার বায়বীয় অঙ্গের কোন অংশের মাধ্যমে ঘটে, তার ভিত্তিতে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা: পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, কিউটিকুলার প্রস্বেদন ও লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

(a) পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (Stromatal transpiration):

পাতায়, কচিকান্ডে, ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ (Guard cell) বেষ্টিত এক ধরনের রন্ধ্র থাকে। এদেরকে পত্ররন্ধ্র (একবচন stoma, বহুবচন stomata) বলে। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের 90-95% হয় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে।



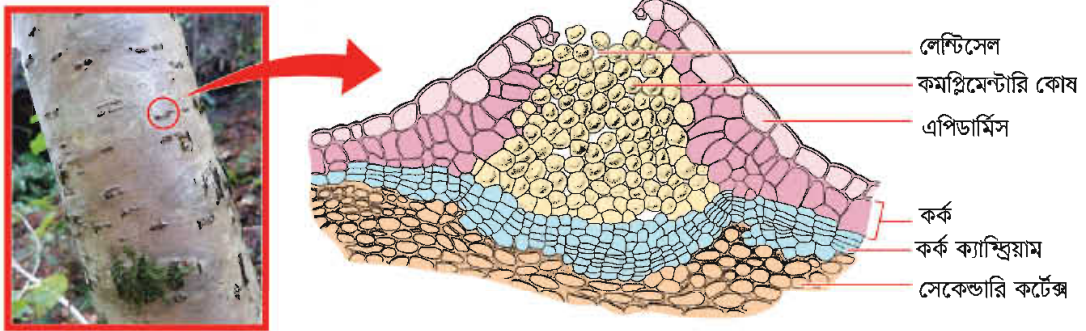
চিত্র 6.03: একটি খোলা এবং একটি বন্ধ পত্ররন্ধ্র

(b) কিউটিকুলার প্রস্বেদন (Cuticular transpiration):

উদ্ভিদের বহিঃত্বকে বিশেষ করে পাতার উপরে এবং নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে। এ আবরণকে কিউটিকল বলে। কিউটিকল ভেদ করে কিছু পানি বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়। এ প্রক্রিয়াকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে।

(c) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration):

উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি হলে কাণ্ডের বাকল ফেটে লেন্টিসেল নামক ছিদ্র সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেলের ভিতরের কোষগুলো আলাদাভাবে সজ্জিত থাকে এবং এর মাধ্যমে কিছু পানি বাইরে বেরিয়ে যায়। একে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে।



চিত্র 6.04: একটি লেন্টিসেল

প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদটি বাষ্পাকারে অতিরিক্ত পানি মুক্ত করে আর এর ফলে সৃষ্ট টানে পানি শোষিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি অনেকগুলো প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল। এদের মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়, বাহ্যিক প্রভাবক ও অভ্যন্তরীণ প্রভাবক।

(a) বাহ্যিক প্রভাবক

(i) **তাপমাত্রা (Temperature):** তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে প্রস্বেদনের হারও ওঠা-নামা করে। অধিক তাপে পানি সহজেই বাষ্পে পরিণত হতে পারে বলে প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রস্বেদনের হারও দ্রুততর হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে তাই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

(ii) **আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity):** বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ও বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতার আনুপাতিক হারকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। কোনো একটি এলাকার বায়ুমণ্ডলে অধিক জলীয়বাষ্প থাকা সত্ত্বেও অধিক ধারণক্ষমতার জন্য তা শুষ্ক হতে পারে। আবার কম জলীয়বাষ্প থাকা সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলের কম ধারণক্ষমতার জন্য এটি সিক্ত হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বায়ু অসম্পৃক্ত থাকে ও জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে কিন্তু অধিক হলে বায়ু সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায় এবং বেশি থাকলে হার কমে যায়।

(iii) **আলো (Light):** আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়, ফলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্ধকারে পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকায় এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আলোর তারতম্যের জন্য পত্ররন্ধ্রের আকারেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ফলে প্রস্বেদনের হারও ওঠা-নামা করে। আলো উদ্ভিদদেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

(iv) **বায়ুপ্রবাহ (Wind):** প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের চারদিকের বায়ু সিক্ত হয়ে ওঠে, ফলে এই প্রক্রিয়ার হার কমতে থাকে। যখন বায়ুপ্রবাহ সম্পৃক্ত বায়ু দূরে সরিয়ে দেয় তখন এই হার আবার বৃদ্ধি পায়। বায়ুপ্রবাহের ফলে পত্রগুলো আন্দোলিত হয় এবং পত্ররন্ধ্রের চাপ পড়ে। ফলে অধিক হারে জলীয়বাষ্প রন্ধ্রপথে বের হয়। এসব কারণে বায়ুপ্রবাহের তারতম্যে প্রস্বেদন হারেরও তারতম্য ঘটে। বায়ুচাপ বৃদ্ধিতে বাষ্পীয়ভবন ক্রিয়া হ্রাস পায়, ফলে প্রস্বেদন কমে যায়। আবার বায়ুচাপ কমে গেলে বাষ্পীয়ভবন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

(b) অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

(i) **পত্ররন্ধ্র:** পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, আয়তন, গঠন এবং অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারের তারতম্য ঘটে।

(ii) **পত্রের সংখ্যা:** পাতার সংখ্যা, আয়তন, গঠন এবং অবস্থানের উপর প্রস্বেদন হারের তারতম্য লক্ষ করা যায়।

(iii) **পত্রফলকের আয়তন:** পত্রফলকের আয়তন বড় হলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। একইভাবে এ আয়তন কম হলে প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

(iv) **উদ্ভিদের বায়ব অঙ্গের আয়তন:** পাতা ও কাণ্ডসহ উদ্ভিদের বায়ব অঙ্গের কলেবর বৃদ্ধি পেলে প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়।

এছাড়া কিউটিকলের উপস্থিতি, স্পনজি প্যারেনকাইমার পরিমাণ এগুলোও প্রস্বেদন হারের তারতম্য ঘটায়।



একক কাজ

কাজ: প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তার পরীক্ষা।

উপকরণ: টবসহ একটি সতেজ উদ্ভিদ, একটি কাচের বেলজার বা সেলোফেন ব্যাগ, সুতা বা ক্লিপ এবং পরিমাণমতো কিছু পানি।

পদ্ধতি: প্রথমেই টবসহ গাছটিকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিতে হবে এবং টবে পরিমাণমতো পানি ঢেলে দিতে হবে। এবার কিছু পাতাসহ একটি শাখাকে সেলোফেন ব্যাগ দিয়ে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে বা ক্লিপ দিয়ে আটকে অথবা বেলজার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ভিতরের বাষ্প বের হতে বা বাইরের বাতাস ঢুকতে না পারে। এ অবস্থায় টবটি এক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: এক ঘণ্টা পর দেখা যাবে, সেলোফেন ব্যাগের ভিতরের গায়ে পানির ফোঁটা জমে আছে এবং পুরো ব্যাগটি অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। কেন এমন হলো তা কি তোমরা বুঝতে পারছ?

সিদ্ধান্ত: যেহেতু সেলোফেন ব্যাগে অন্য কোনো পানি ঢোকার সুযোগ ছিল না, তাই ঐ পানির কণাগুলো যে পাতা থেকেই বেরিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এতে প্রমাণিত হলো যে উদ্ভিদ তার বায়বীয় অঙ্গ দিয়ে পানি বাষ্পাকারে দেহের বাইরে বের করে দেয়।



চিত্র 6.05: প্রস্বেদনের পরীক্ষা

সতর্কতা:

- টবের উদ্ভিদটি অবশ্যই সতেজ হতে হবে।
- সেলোফেন ব্যাগের মুখ ভালোভাবে বেঁধে বায়ুরোধী করতে হবে।

প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল (Transpiration is a necessary evil):

প্রস্বেদনের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্তমানে সকল বিজ্ঞানীই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে মনে করা হয়। এ প্রক্রিয়ার উপরে সজীব উদ্ভিদ কোষের বিপাকীয় কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রস্বেদনের ফলে

জাইলেমবাহিকায় টান পড়ে। এই টানের ফলে উদ্ভিদের মূলরোম কর্তৃক শোষিত পানি এবং খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়। এ টানের ঘাটতি হলে পানি শোষণ কমে যাবে এবং খাদ্য প্রস্তুতসহ অনেক বিপাকীয় কার্যক্রম থল্হ হয়ে যাবে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার মেসোফিলে ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয়, যা পানি শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ প্রস্বেদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পত্রফলক দিয়ে শোষিত তাপশক্তি হ্রাস করে পাতার কোষগুলোর তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখে।

অন্যদিকে, গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের বহু ধরনের উপকার করলেও এর কিছু অপকারী ভূমিকাও রয়েছে। যেমন: পানি শোষণের চেয়ে প্রস্বেদনে পানি হারানোর হার বেশি হলে উদ্ভিদের জন্য পানি এবং খনিজের ঘাটতি দেখা দিবে। এর ফলে উদ্ভিদটির মৃত্যু হতে পারে। মাটিতে পানির ঘাটতি থাকলে শোষণ কম হবে কিন্তু প্রস্বেদন পূর্বের মতো চলতে থাকবে। এ অবস্থাকে ঠেকাতে প্রকৃতি শীত মৌসুমে বহু উদ্ভিদের পাতা ঝরিয়ে দেয়। প্রস্বেদনের অভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপন চাপ ঘাটতি হবে না, ফলে অভিস্রবণ কম হবে।

এমতাবস্থায় বলা যায়, প্রস্বেদন কিছু ক্ষতিসাধন করলেও এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় একটি কার্যক্রম। বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের জন্য বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে ‘প্রয়োজনীয় ক্ষতি’ (Necessary Evil) নামে অভিহিত করেছেন। তবে সার্বিক বিচারে এটি উদ্ভিদকে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা দেয় বলে এর অপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া বিবর্তিত হয়েছে।

6.3 মানবদেহে রক্ত সঞ্হন (Blood Circulation in human body)

রক্ত জীবনীশক্তির মূল। রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কোষে অক্সিজেন এবং খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে। ফলে দেহের সব কোষ সজীব এবং সক্রিয় থাকে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশে চলাচল করে, তাকে রক্ত সঞ্হনতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রে প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমেই খাদ্য, অক্সিজেন এবং রক্তের বর্জ্য পদার্থ দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়।

মানবদেহে রক্তপ্রবাহ কেবল হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কখনো এর বাইরে আসে না। এ ধরনের সঞ্হনতন্ত্রকে বন্ধ সঞ্হনতন্ত্র (Close circulatory system) বলা হয়। সারা দেহে রক্ত একবার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণের জন্য মাত্র এক মিনিট বা তার চেয়েও কম সময় লাগে। বন্ধ সঞ্হনতন্ত্রের বড় সুবিধা হলো এ ব্যবস্থায়,

(a) রক্ত সরাসরি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে পৌঁছে।

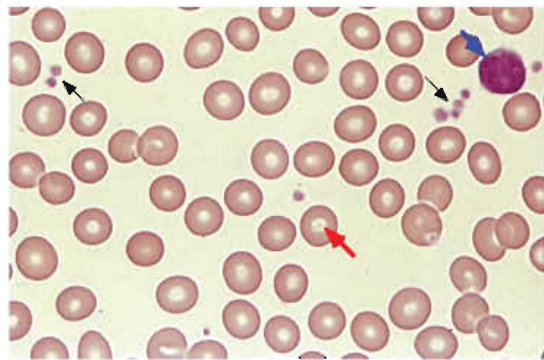
(b) রক্তবাহী নালির ব্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেহ কোনো বিশেষ অঙ্গে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(c) রক্ত বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করে দ্রুত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। অন্যান্য তন্ত্রের তুলনায় রক্ত সংবহনতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও এর গঠনশৈলী মোটামুটি সাধারণ।

পরিবহনতন্ত্রকে সাধারণত দুটি অংশে ভাগ করা হয়, রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood circulatory system): হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি নিয়ে গঠিত এবং লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system): লসিকা, লসিকানালি ও ল্যাকটিয়েলনালি নিয়ে গঠিত।

6.3.1 রক্ত (Blood)

রক্ত একটি অস্বচ্ছ, মৃদু স্ফারীয় এবং লবণাক্ত তরল পদার্থ। রক্ত হৃৎপিণ্ড, শিরা, উপশিরা, ধমনি, শাখা ধমনি এবং কৈশিকনালি পথে আবর্তিত হয়। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে রক্তের রং লাল দেখায়। হাড়ের লাল অস্থিমজ্জাতে রক্তকণিকার জন্ম হয়।



চিত্র 6.06: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা রক্তের উপাদান।
লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা
যথাক্রমে লাল, নীল ও কালো রঙের তীর দিয়ে
নির্দেশিত

রক্তের উপাদান

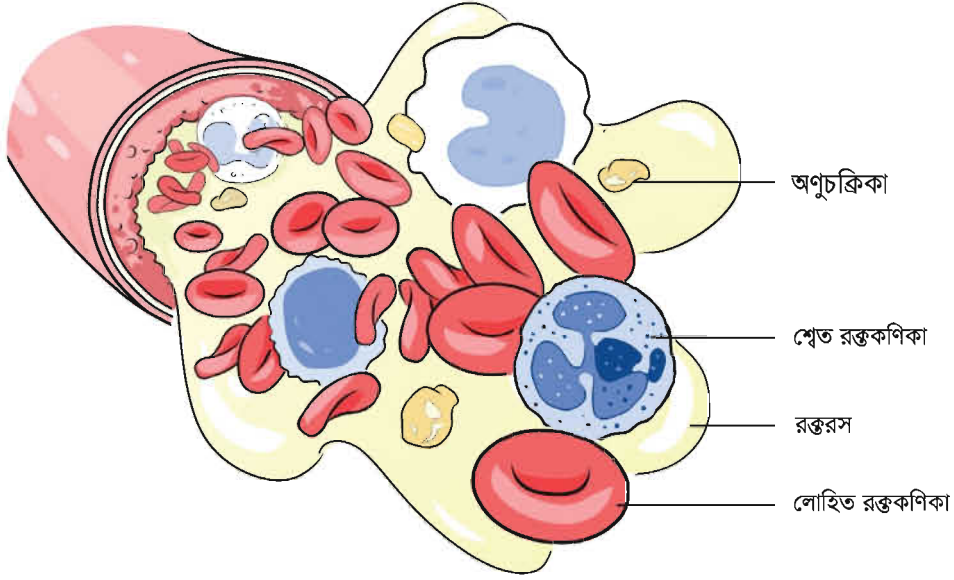
রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তরস এবং কয়েক ধরনের রক্তকণিকার সমন্বয়ে রক্ত গঠিত।

(a) রক্তরস (Plasma):

রক্তের বর্ণহীন তরল অংশকে রক্তরস বলে। সাধারণত রক্তের শতকরা প্রায় 55 ভাগ রক্তরস। রক্তরসের প্রধান উপাদান পানি। এছাড়া বাকি অংশে কিছু প্রোটিন, জৈবযৌগ ও সামান্য অজৈব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে যে পদার্থগুলো থাকে তা হলো:

- (i) প্রোটিন, যথা অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন ও ফাইব্রিনোজেন
- (ii) গ্লুকোজ
- (iii) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বি কণা
- (iv) খনিজ লবণ
- (v) ভিটামিন
- (vi) হরমোন
- (vii) এন্টিবডি
- (viii) বর্জ্য পদার্থ যেমন: কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি।

এছাড়া সামান্য পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও অ্যামাইনো এসিড থাকে। আমরা খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করি তা পরিপাক হয়ে অন্ত্রের গায়ে শোষিত হয় এবং রক্তরসে মিশে ফর্ম-১৮, জীববিজ্ঞান- ৯ম-১০ম শ্রেণি



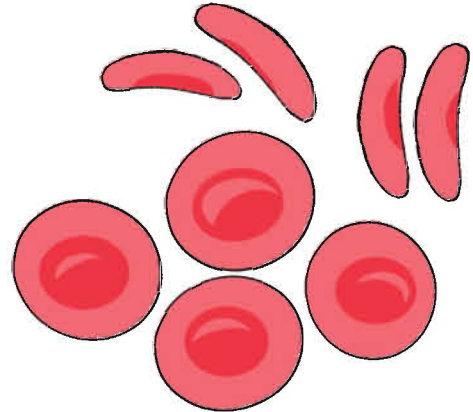
চিত্র 6.07: বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। এভাবে দেহকোষগুলো পুষ্তিকর দ্রব্যাদি গ্রহণ করে দেহের পুষ্টির সাধন এবং ক্ষয়পূরণ করে।

(b) রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

মানবদেহে তিন ধরনের রক্তকণিকা দেখা যায়, লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles), শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles) এবং অণুচক্রিকা (Blood Platelets)। যদিও এগুলো সব কোষ, তবে রক্তের প্লাজমার মধ্যে ভাসমান কণার সাথে তুলনা করে এদেরকে অনেক দিন আগে রক্তকণিকা নাম দেওয়া হয়েছিল, তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এখনকার মতো উন্নত ছিল না। সেই নাম এখনও প্রচলিত।

(i) লোহিত রক্তকণিকা: মানবদেহে তিন ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এটি শ্বাসকার্যে অক্সিজেন পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাল অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয়। এর গড় আয়ু 120 দিন। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না এবং দেখতে অনেকটা দ্বি-অবতল বৃত্তের মতো। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় 50 লক্ষ।



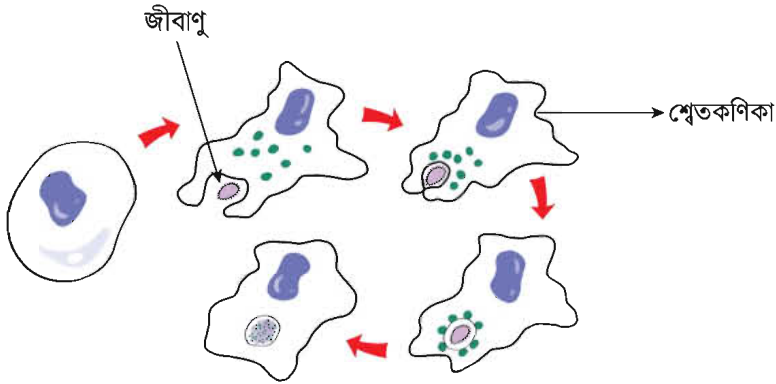
চিত্র 6.08: লোহিত রক্তকণিকা

এটি শ্বেত রক্তকণিকার চেয়ে প্রায় 500 গুণ বেশি। পুরুষের তুলনায় নারীদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা কম থাকে। তুলনামূলকভাবে শিশুদের দেহে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বেশি থাকে। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়, আবার সমপরিমাণে তৈরিও হয়। লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসেবে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করে।

হিমোগ্লোবিন: হিমোগ্লোবিন এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ। লোহিত রক্তকণিকায় এর উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়। রক্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ হিমোগ্লোবিন না থাকলে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা (anemia) দেখা দেয়। বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী এ রোগে আক্রান্ত।

(ii) শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

শ্বেতকণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এগুলো হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় আকারের কোষ। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১-১৫ দিন। হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা, ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। শ্বেত কণিকার সংখ্যা RBC-এর তুলনায় অনেক কম। এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এটি জীবাণুকে ধ্বংস করে।

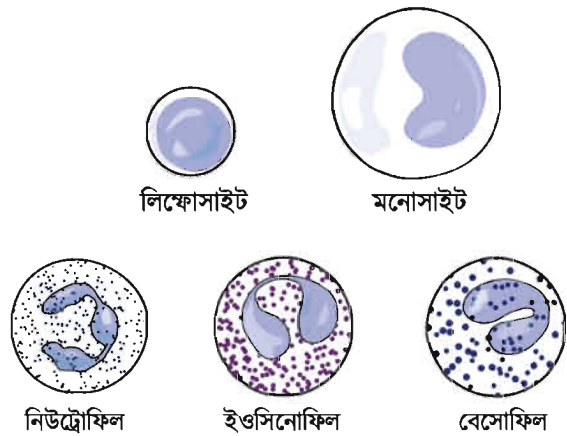


চিত্র 6.09: শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে থাকে

শ্বেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্য দিয়ে নিজেরাই চলতে পারে। রক্ত জালিকার প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। দেহ বাইরের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে, দ্রুত শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে 4-10 হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়। স্তন্যপায়ীদের রক্তকোষগুলোর মধ্যে শুধু শ্বেত রক্ত কণিকায় DNA থাকে।

প্রকারভেদ: গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত কণিকাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা (ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) গ্রানুলোসাইট বা দানায়ুক্ত।

(ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট : এ ধরনের শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ। অ্যাগ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুই রকমের; যথা-লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিম্ফনোড, টনসিল, প্লিহা ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিম্ফোসাইটগুলো বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ছোট কণিকা। মনোসাইট ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট বড় কণিকা। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবডির দ্বারা দেহে প্রবেশ করা রোগজীবাণু ধ্বংস করে। এভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে।



চিত্র 6.10: বিভিন্ন প্রকার শ্বেত কণিকা

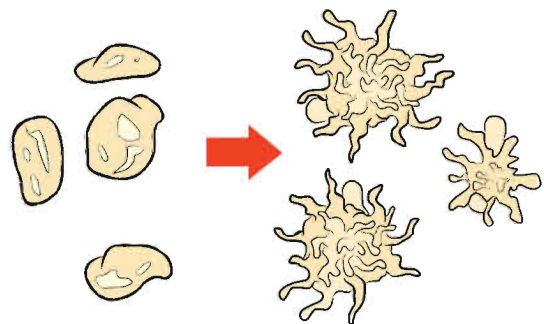
(খ) গ্রানুলোসাইট : এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানায়ুক্ত। গ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকাগুলো নিউক্লিয়াসের আকৃতির ভিত্তিতে তিন প্রকার যথা: নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল।

নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতরে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

(iii) অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট

ইংরেজিতে এদেরকে প্লেটলেট (Platelet) বলে। এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা রড আকারের হতে পারে। এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অঙ্গাণু- মাইটোকন্ড্রিয়া, গল্গি বস্তু থাকে; কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেকের মতে, অণুচক্রিকাগুলো সম্পূর্ণ কোষ নয়; এগুলো অস্থি মজ্জার বৃহদাকার কোষের ছিন্ন অংশ। অণুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু ৫-১০ দিন। পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। অসুস্থ দেহে এদের সংখ্যা আরও বেশি হয়।

অণুচক্রিকার প্রধান কাজ হলো রক্ত তঞ্চন করা বা জমাট বাঁধানোতে (blood clotting) সাহায্য করা। যখন কোনো রক্তবাহিকা বা কোনো টিস্যু



চিত্র 6.11: অণুচক্রিকা এবং তার আকার পরিবর্তন।

আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কেটে যায়, তখন সেখানকার অণুচক্রিকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে অনিয়মিত আকার ধারণ করে এবং থ্রম্বোপ্লাসটিন (Thromboplastin) নামক পদার্থ তৈরি করে। এ পদার্থগুলো রক্তের প্রোটিন প্রোথ্রমবিনকে থ্রমবিনে পরিণত করে। থ্রমবিন পরবর্তী সময়ে রক্তরসের প্রোটিন- ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন জালকে পরিণত করে রক্তকে জমাট বাধায় কিংবা রক্তের তঞ্চন ঘটায়। ফাইব্রিন একধরনের অদ্রবণীয় প্রোটিন, যা দ্রুত সুতার মতো জালিকা প্রস্তুত করে। এটি ক্ষত স্থানে জমাট বাঁধে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। তবে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি আরও জটিল, এ প্রক্রিয়ায় জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এবং ভিটামিন K ও ক্যালসিয়াম আয়ন জড়িত থাকে।

রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ অণুচক্রিকা না থাকলে রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না। ফলে অনেক সময় রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে।



একক কাজ

কাজ: নিচের ছকটি খাতায় আঁক ও পূরণ কর।

লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে পার্থক্য :

বৈশিষ্ট্য	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা
(a) নিউক্লিয়াস		
(b) আকার		
(c) হিমোগ্লোবিন		
(d) সংখ্যা		
(e) কাজ		

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের নানাবিধ কাজ করে, যেমন:

(a) অক্সিজেন পরিবহন: লোহিত রক্তকণিকা অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে।

(b) কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ: রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোষগুলোতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, রক্তরস সোডিয়াম বাই কার্বনেটরূপে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এবং নিঃশ্বাস বায়ুর সাথে ফুসফুসের সাহায্যে দেহের বাইরে বের করে দেয়।

(c) খাদ্যসার পরিবহন: রক্তরস গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, চর্বিবর্ণা ইত্যাদি কোষে সরবরাহ করে।

(d) তাপের সমতা রক্ষা: দেহের মধ্যে অনবরত দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে। এতে করে বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মাত্রার তাপ সৃষ্টি হয় এবং তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে দেহের সর্বত্র তাপের সমতা রক্ষা হয়।

(e) বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন: রক্ত দেহের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ বহন করে এবং বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সেসব ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসেবে নিষ্কাশন করে।

(f) হরমোন পরিবহন: হরমোন নালিবিহীন গ্রন্থিতে তৈরি এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা রস। এই রস সরাসরি রক্তে মিশে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চারিত হয় এবং বিভিন্ন জৈবিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(g) রোগ প্রতিরোধ: কয়েক প্রকারের শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন উৎপাদনের মাধ্যমে রক্ত দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(h) রক্ত জমাট বাঁধা: দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং দেহের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

6.3.2 ব্লাড গ্রুপ বা রক্তের গ্রুপ

একজন আশঙ্কাজনক বা মূর্খ রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন, তার রক্তের গ্রুপ ‘বি’ পজিটিভ। তোমরা এ রকম বিজ্ঞাপন প্রায়শই টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাও। রক্তের গ্রুপ বা ব্লাড গ্রুপ কী? কেনইবা ব্লাড গ্রুপ জানা প্রয়োজন? অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ব্যক্তির লোহিত রক্ত কণিকায় A এবং B নামক দুই ধরনের অ্যান্টিজেন (antigens) থাকে এবং রক্তরসে a ও b দুই ধরনের অ্যান্টিবডি (antibody) থাকে। এই অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা যায়। একে ব্লাড গ্রুপ বলে। বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার 1901 সালে মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা A, B, AB এবং O— এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন। সাধারণত একজন মানুষের রক্তের গ্রুপ আজীবন একই রকম থাকে।

নিচের সারণিতে রক্তের গ্রুপের অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি দেখানো হলো:

রক্তের গ্রুপ	অ্যান্টিজেন (লোহিত রক্তকণিকায়)	অ্যান্টিবডি (রক্তরসে)
A	A	b
B	B	a
AB	A, B	নেই
O	নেই	a, b

আমরা উপরের সারণিতে রক্তে বিভিন্ন অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি উপস্থিতি দেখেছি। এর ভিত্তিতে আমরা ব্লাড গ্রুপকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি। যেমন:

গ্রুপ A: এ শ্রেণির রক্তে A এন্টিজেন ও b এন্টিবডি থাকে।

গ্রুপ B: এ শ্রেণির রক্তে B এন্টিজেন ও a এন্টিবডি থাকে।

গ্রুপ AB: এই শ্রেণির রক্তে A ও B এন্টিজেন থাকে এবং কোনো এন্টিবডি থাকে না।

গ্রুপ O: এ শ্রেণির রক্তে কোনো এন্টিজেন থাকে না কিন্তু a ও b এন্টিবডি থাকে।

দাতার লোহিত কণিকা বা কোষের কোষঝিল্লিতে উপস্থিত অ্যান্টিজেন যদি গ্রহীতার রক্তরসে উপস্থিত এমন অ্যান্টিবডির সংস্পর্শে আসে, যা উক্ত অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করতে সক্ষম তাহলে, অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া হয়ে গ্রহীতা বা রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। এজন্য সব গ্রুপের রক্ত সবাইকে দেওয়া যায় না। যেমন: তোমার রক্তের গ্রুপ যদি হয় A (অর্থাৎ লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে A অ্যান্টিজেন আছে) এবং তোমার বন্ধুর রক্তের গ্রুপ যদি B হয় (অর্থাৎ রক্তরসে a অ্যান্টিবডি আছে) তাহলে তুমি তোমার বন্ধুকে রক্ত দিতে পারবে না। যদি দাও তাহলে তোমার A অ্যান্টিজেন তোমার বন্ধুর a অ্যান্টিবডির সাথে বিক্রিয়া করে বন্ধুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই দাতার রক্তে যে অ্যান্টিজেন থাকে তার সাথে মিলিয়ে এমনভাবে গ্রহীতা নির্বাচন করতে হয় যেন তার রক্তে দাতার অ্যান্টিজেনের সাথে সম্পর্কিত অ্যান্টিবডিটি না থাকে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোন গ্রুপ কাকে রক্ত দিতে পারবে বা পারবে না, তার একটা ছক বানানো যায়।

দাতা

গ্রুপ	O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
AB+								
AB-								
A+								
A-								
B+								
B-								
O+								
O-								

গ্রহীতা

চিত্র 6.12: কোন গ্রুপের রক্ত কাকে দেওয়া যাবে তার ছক

সারণি: ABO পদ্ধতিতে মানুষের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার তালিকা

রক্তের গ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	A, AB	A, O
B	B, AB	B, O
AB	AB	A, B, AB, O
O	A, B, AB, O	O

উপরের সারণিটি লক্ষ করলে দেখতে পারবে O গ্রুপের রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তি সব গ্রুপের রক্তের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে। এদের বলা হয় সর্বজনীন রক্তদাতা (universal donor)। AB রক্তধারী ব্যক্তি যেকোনো ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করতে পারে। তাই তাকে সর্বজনীন রক্তগ্রহীতা (universal recipient) বলা হয়।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বজনীন রক্তদাতা কিংবা সর্বজনীন রক্তগ্রহীতার ধারণা খুব একটা প্রযোজ্য নয়। কেননা, রক্তকে অ্যান্টিজেনের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করার ক্ষেত্রে ABO পদ্ধতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও রক্তে আরও অসংখ্য অ্যান্টিজেন থাকে, যেগুলো ক্ষেত্রবিশেষে অসুবিধার কারণ হতে পারে। যেমন: রেসাস (Rh) ফ্যাক্টর, যা এক ধরনের অ্যান্টিজেন। কারো রক্তে এই ফ্যাক্টর উপস্থিত থাকলে তাকে বলে পজিটিভ আর না থাকলে বলে নেগেটিভ। এটি যদি না মেলে তাহলেও গ্রহীতা বা রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তাই ABO গ্রুপের পাশাপাশি রেসাস ফ্যাক্টরও পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা চাই। অর্থাৎ রেসাস ফ্যাক্টরকে বিবেচনায় নেওয়া হলে রক্তের গ্রুপগুলো হবে A+, A-, B+ B-, AB+, AB-, O+ এবং O-। নিগেটিভ গ্রুপের রক্তে যেহেতু রেসাস ফ্যাক্টর অ্যান্টিজেন নেই, তাই এটি পজিটিভ গ্রুপকে দেওয়া যাবে কিন্তু পজিটিভ গ্রুপের রক্ত নেগেটিভ গ্রুপকে দেয়া যাবে না।

রক্তদান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা:

আঘাত, দুর্ঘটনা, শল্যচিকিৎসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হলে দেহে রক্তের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য ঐ ব্যক্তির দেহে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। জরুরি ভিত্তিতে এই রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য রোগীর দেহে অন্য মানুষের রক্ত দিতে হয়। অন্যকে রক্তদান করা বর্তমানে একটি সাধারণ ঘটনা। জরুরি অবস্থায় অন্য ব্যক্তির রক্ত সরাসরি বা ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা রক্ত রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। কোনো ব্যক্তির শিরার মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে অন্যের রক্ত প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে রক্ত সঞ্চালন (Blood transfusion) বলে। এটি একটি চমৎকার ফলপ্রদ ব্যবস্থা, যার ফলে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। তবে কোনো অবস্থাতেই রোগীর রক্তের গ্রুপ ও প্রকৃতি পরীক্ষা না করে এক রোগীর দেহে অন্য কোনো ব্যক্তির বা ব্লাড ব্যাংকে রক্ষিত রক্ত প্রবেশ করানো উচিত নয়। ব্যতিক্রম হলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়ে রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে বেড়ে যায়। যেমন: রক্তকণিকাগুলোর জমাট বাঁধা, বিশ্লিষ্ট হওয়া, জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব এবং প্রস্রাবের সাথে হিমোগ্লোবিন নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে, এটি আমাদের সবার জন্য একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেহেতু রক্তের কোনো বিকল্প নেই, তাই এরূপ অবস্থায় অনেক সময় প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয় এবং অন্যের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ঐ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়। এরূপ জরুরি পরিস্থিতিতে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

অন্যকে রক্তদান করা একটি মহৎ কাজ। এতে রক্তদাতার নিজের কোনো ক্ষতি হয় না। একজন সুস্থ মানুষের দেহ থেকে ৪৫০ মিলি রক্ত বের করে দিলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। তার দেহ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করতে পারে। দেখা গেছে, কোনো সুস্থ ব্যক্তি চার মাস পর পর রক্তদান করলে দাতার দেহে সামান্যতম কোনো অসুবিধা হয় না।

বর্তমানে রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণে নানা রকম কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। যেমন: কোনো বিশেষ দিবসে বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন। এতে জনসাধারণের মাঝে রক্তদান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। অতীতের তুলনায় মানুষ এখন রক্তদান এবং গ্রহণ সম্পর্কে অধিক আগ্রহী ও সচেতন।

৬.৪ হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ

৬.৪.১ হৃৎপিণ্ডের গঠন

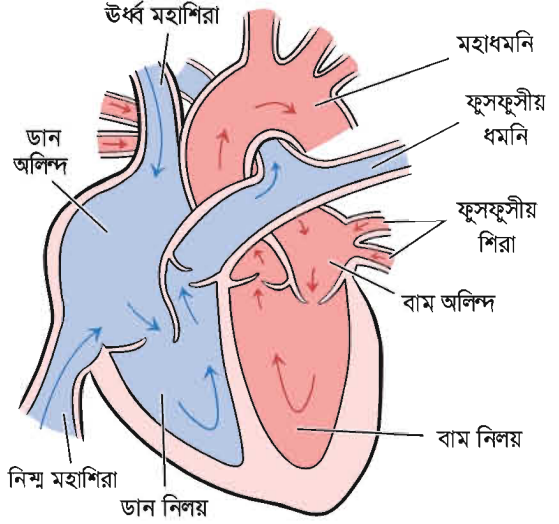
হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গ। এটি হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত। হৃৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। হৃৎপিণ্ড-প্রাচীরে থাকে তিনটি স্তর, বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম, মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম এবং অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম।

বহিঃস্তর (Epicardium): এটি মূলত যোজক কলা নিয়ে গঠিত। এই স্তরটিতে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি থাকে এবং এটি আবরণী কলা দিয়ে আবৃত।

মধ্যস্তর (Myocardium): এটি বহিঃস্তর এবং অন্তঃস্তরের মাঝখানে অবস্থান করে। দৃঢ় অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে এ স্তর গঠিত।

অন্তঃস্তর (Endocardium): এটি সবচেয়ে ভিতরের স্তর। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো অন্তঃস্তর দিয়ে আবৃত। এই স্তরটি হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলোকেও আবৃত করে রাখে। হৃৎপিণ্ডের ভিতরের স্তর ফাঁপা এবং চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি নিচের দুটির চেয়ে আকারে ছোট। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান এবং বাম অলিন্দ (right & left atrium) বলে এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান এবং বাম নিলয় (right & left ventricle) বলে। অলিন্দ দুটির প্রাচীর তুলনামূলকভাবে পাতলা, আর নিলয়ের প্রাচীর পুরু। অলিন্দ এবং নিলয় যথাক্রমে আন্তঃঅলিন্দ পর্দা এবং আন্তঃনিলয় পর্দা দিয়ে পরস্পর পৃথক থাকে।

হৃৎপিণ্ডের উভয় অলিন্দ এবং নিলয়ের মাঝে যে ছিদ্রপথ আছে, তা খোলা বা বন্ধ করার জন্য ভালভ (valve) বা কপাটিকা থাকে। ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথ তিন পাল্লাবিশিষ্ট ট্রাইকাসপিড ভালভ দিয়ে সুরক্ষিত। একইভাবে বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয় দুই পাল্লাবিশিষ্ট বাইকাসপিড ভালভ (মাইট্রাল ভালভ নামেও পরিচিত) দিয়ে সুরক্ষিত থাকে। মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির মুখে অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা থাকে। এদের অবস্থানের ফলে পাম্প করা রক্ত একই দিকে চলে এবং এক ফোঁটা রক্তও উল্টো দিকে ফিরে আসতে পারে না।



চিত্র 6.13: মানব হৃৎপিণ্ড

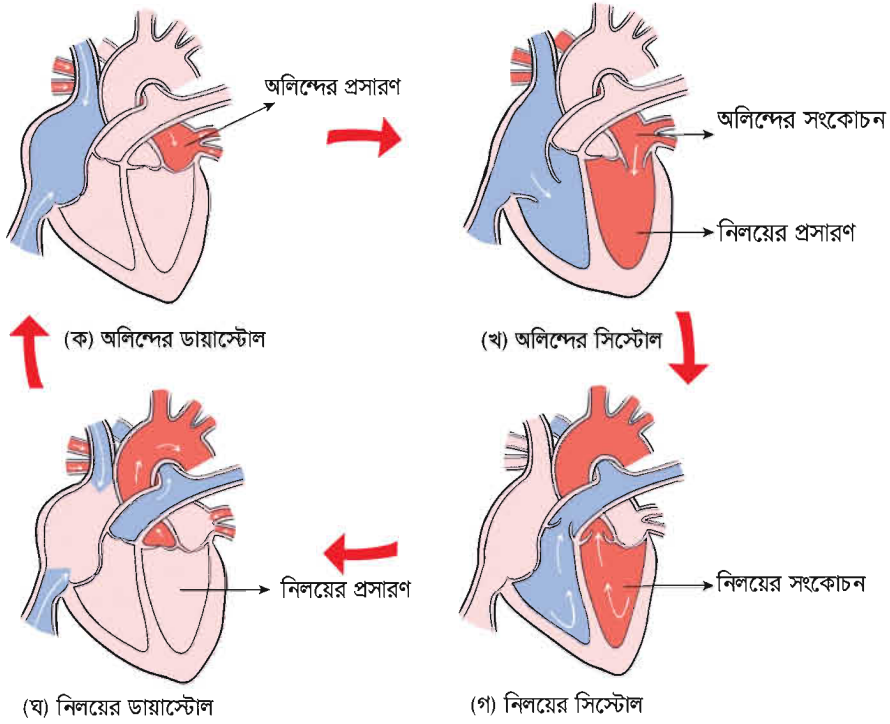
6.4.2 হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

আমরা আগেই জেনেছি যে হৃৎপিণ্ড একটি পাম্পের মতো কাজ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণ দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের অবিরাম সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলা হয় সিস্টোল এবং প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টোল। হৃৎপিণ্ডের একবার সিস্টোল-ডায়াস্টোলকে একত্রে হৃৎস্পন্দন (heart beat) বলে।

অলিন্দ দুটি প্রসারিত হলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। উর্ধ্ব মহাশিরার ভিতর দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরার ভিতর দিয়ে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।

অলিন্দ দুটির সংকোচন হলে নিলয় দুটির পেশি প্রসারিত হয়। তখন ডান অলিন্দ-নিলয়ের ছিদ্রপথের ট্রাইকাসপিড ভালভ খুলে যায় এবং ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। ঠিক এই সময়ে বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয়ের বাইকাসপিড ভালভ খুলে যায় তখন বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এর পরপরই ছিদ্রগুলো কপাটিকা দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে নিলয় থেকে রক্ত আর অলিন্দে প্রবেশ করতে পারে না।

যখন নিলয় দুটি সংকুচিত হয়, তখন ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এখানে রক্ত পরিশোধিত হয়। ঠিক একই সময়ে বাম নিলয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত মহাধমনির মাধ্যমে সারা দেহে পরিবাহিত হয় এবং উভয় ধমনির অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রক্ত পুনরায় নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না। এভাবে হৃৎপিণ্ডে



চিত্র 6.14 : হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন ও রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

পর্যায়ক্রমিক সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

হৃৎপিণ্ডের কাজ: রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃৎপিণ্ড। এর সাহায্যেই সংবহনতন্ত্রের রক্তপ্রবাহ সচল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো সম্পূর্ণ বিভক্ত থাকায় এখানে অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে না।

6.4.3 রক্তবাহিকা (Blood Vessel)

যেসব নালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয়, তাকে রক্তনালি বা রক্তবাহিকা বলে। এসব নালিপথে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। গঠন, আকৃতি এবং কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা বা রক্তনালি তিন ধরনের—ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা।

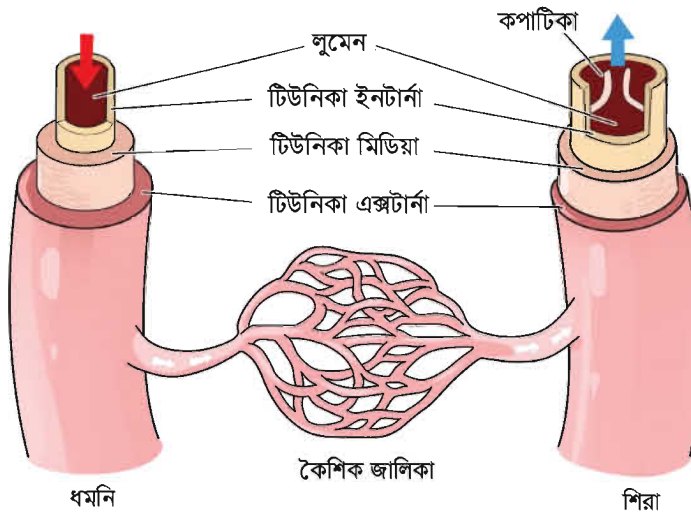
(a) ধমনি (Artery)

যেসব রক্তনালির মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারাদেহে বাহিত হয় তাকে ধমনি বলে। ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমধর্মী ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে পৌঁছে দেয়।

ধমনির প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট:

- (i) টিউনিকা এক্সটার্না (Tunica externa): এটি তন্তুময় যোজক কলা দিয়ে তৈরি বাইরের স্তর।
- (ii) টিউনিকা মিডিয়া (Tunica media): এটি বৃত্তাকার অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি মাঝের স্তর।
- (iii) টিউনিকা ইন্টার্না (Tunica interna): এটি সরল আবরণী কলা দিয়ে তৈরি ভিতরের স্তর।

ধমনির প্রাচীর পুরু ও স্থিতিস্থাপক। ধমনিতে কপাটিকা থাকে না, এর নালিপথ সরু। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সংকোচনের ফলে দেহে ছোট-বড় সব ধমনিতে রক্ত তরঙ্গের মতো প্রবাহিত হয়। এতে ধমনিগাত্র সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ধমনির এই স্ফীতি এবং সংকোচনকে নাড়িস্পন্দন বলে। ধমনির ভিতর রক্তপ্রবাহ, ধমনিগাত্রের সংকোচন, প্রসারণ এবং স্থিতিস্থাপকতা নাড়িস্পন্দনের প্রধান কারণ। হাতের কজির ধমনির উপর হাত রেখে নাড়িস্পন্দন অনুভব করা যায়।



চিত্র 6.15: বিভিন্ন ধরনের রক্ত বাহিকা

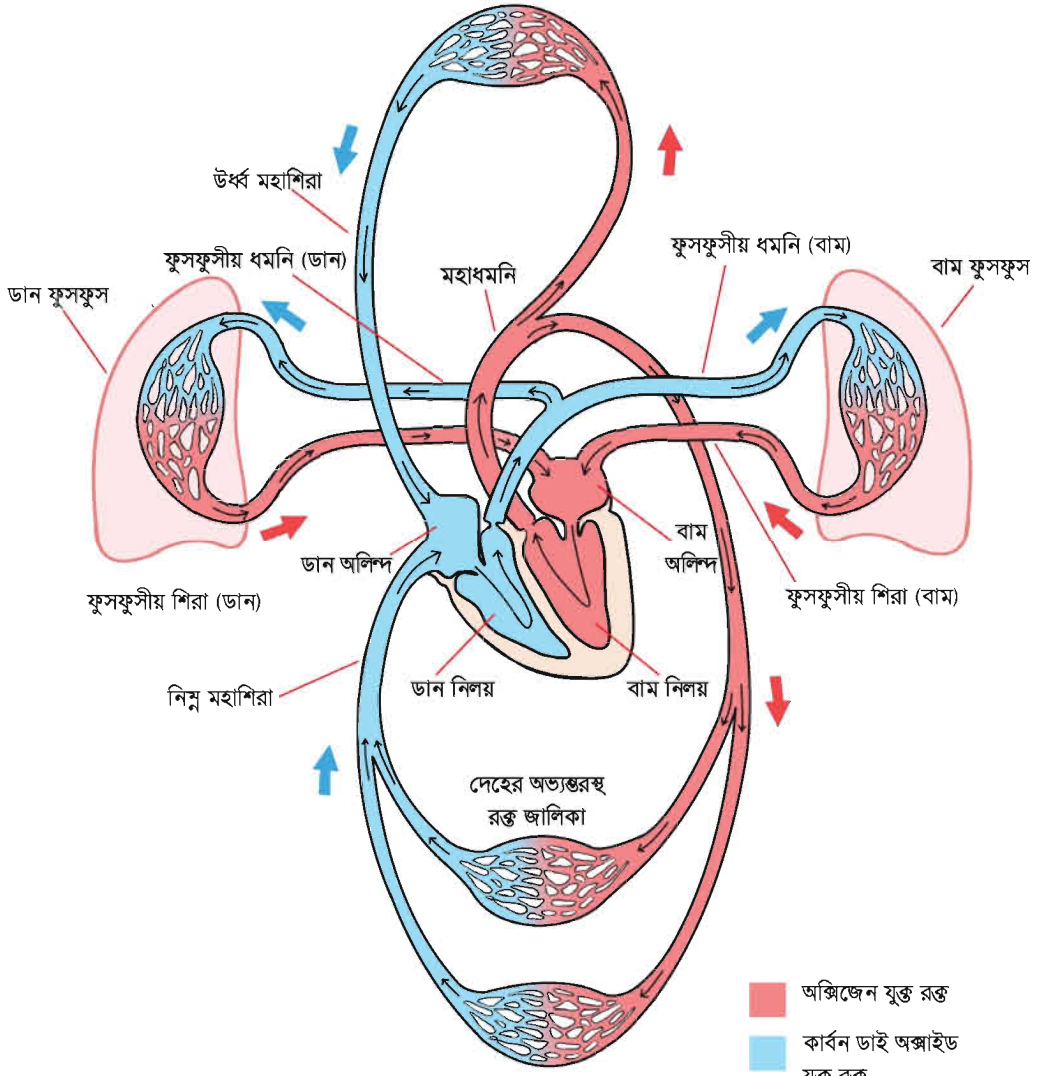
(b) শিরা (Vein)

যেসব নালি দিয়ে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। এরা ধমনির মতোই সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে। শিরাগুলো সাধারণত দেহের বিভিন্ন স্থানের কৈশিকনালি থেকে আরম্ভ হয় এবং এ রকম অসংখ্য নালি একত্রে সূক্ষ্ম শিরা, উপশিরা, অতঃপর শিরা এবং মহাশিরায় পরিণত হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো তিন স্তরবিশিষ্ট। শিরার প্রাচীর কম পুরু, কম স্থিতিস্থাপক ও কম পেশিময়। এদের নালিপথ একটু চওড়া এবং কপাটিকা থাকে। ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে আসা শিরাটি ছাড়া অন্য সব শিরা কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয়।

(c) কৈশিক জালিকা (Capillaries)

পেশিতন্তুতে চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তনালি দেখা যায়। একে কৈশিক জালিকা বা কৈশিক নালি বলে। এগুলো একদিকে ক্ষুদ্রতম ধমনি এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম শিরার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ফলে ধমনি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কৈশিক নালিতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকটি কোষকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এদের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। এই পাতলা প্রাচীর ভেদ করে রক্তে দ্রবীভূত সব বস্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষে প্রবেশ করে।

মাথা ও হাতের মধ্যকার রক্ত জালিকা



পায়ের মধ্যকার রক্ত জালিকা

চিত্র 6.16: মানবদেহে রক্ত সংবহন



একক কাজ

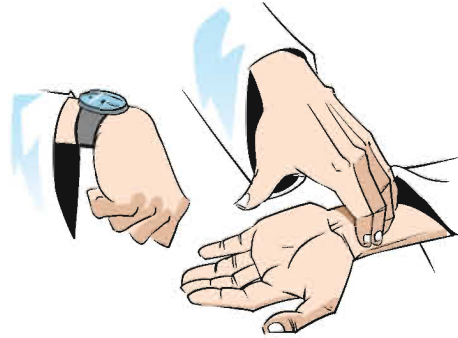
কাজ: ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য কর

বৈশিষ্ট্য	ধমনি	শিরা
(a) উৎপত্তি ও সমাপ্তি		
(b) রক্তপ্রবাহের দিক		
(c) রক্তের প্রকৃতি		
(d) প্রাচীর		
(e) ভিতরের নালিপথ		
(f) কপাটিকা		
(g) অবস্থান		

6.4.4 রক্তচাপ (Blood Pressure)

রক্তপ্রবাহের সময় ধমনির গায়ে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থায় ধমনির গায়ে রক্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক থাকে। একে সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure) বলে। হৃৎপিণ্ডের (প্রকৃতপক্ষে নিলয়ের) প্রসারণ বা ডাইয়াস্টোল অবস্থায় রক্তচাপ সবচেয়ে কম থাকে। একে ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure) বলে।

আদর্শ রক্তচাপ: চিকিৎসকদের মতে, পরিণত বয়সে একজন মানুষের আদর্শ রক্তচাপ (Blood pressure) সাধারণত 120/80 মিলিমিটার মানের কাছাকাছি। রক্তচাপকে দুটি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়। প্রথমটি উচ্চমান এবং দ্বিতীয়টি নিম্নমান। রক্তের উচ্চ চাপকে সিস্টোলিক (Systolic) চাপ বলে যার আদর্শ মান 120 মিলিমিটারের নিচে। নিম্নচাপকে ডায়াস্টোলিক (Diastolic) চাপ বলে। এই চাপটির আদর্শ মান 80 মিলিমিটারের নিচে। এই চাপটি হৃৎপিণ্ডের দুটি বিটের মাঝামাঝি সময় রক্তনালিতে সৃষ্টি হয়। দুধরনের রক্তচাপের পার্থক্যকে ধমনিঘাত বা নাড়িঘাত চাপ (Pulse pressure) বলা হয়। সাধারণত সুস্থ



চিত্র 6.17: নাড়ি বা পালস দেখা

অবস্থায় হাতের কজিতে রেট তথা হৃৎস্পন্দনের মান প্রতি মিনিটে 60-100। হাতের কজিতে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে পালস রেট বের করা যায়। স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) বা সংক্ষেপে বিপি যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ মাপা যায়। এই যন্ত্র দিয়ে ডায়াস্টোলিক ও সিস্টোলিক চাপ দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।



একক কাজ

কাজ: তুমি তোমার বন্ধু, ভাই, বোনের প্রতি মিনিটের নাড়িস্পন্দন গণনা কর। দৌড়ে আসার পর পুনরায় তাদের নাড়িস্পন্দন গণনা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করছ কি? কেন এমন হলো তা ব্যাখ্যা কর।

উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure or hypertension)

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক হিসেবে গণ্য করা হয়। সম্ভ্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে 2020 সালের মধ্যে স্ট্রোক ও করোনারি ধমনির রোগ হবে বিশ্বের এক নম্বর মরণব্যাদি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়বে মহামারী আকারে। হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপ কী? রক্ত চলাচলের সময় রক্তনালিগাঠে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত সিস্টোলিক চাপ 120 মিলিমিটার পারদের নিচে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ 80 মিলিমিটার পারদের নিচের মাত্রাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। আর এই রক্তচাপ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই আমরা তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি।

উচ্চ রক্তচাপ ঝুঁকির কারণ: বাবা বা মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তার সন্তানদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়াও যারা স্নায়বিক চাপে (Tension) বেশি ভোগেন অথবা ধূমপানের অভ্যাস আছে, তাদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। দেহের ওজন বেশি বেড়ে গেলে কিংবা লবণ এবং চর্বিযুক্ত খাদ্য বেশি খেলে এমনকি পরিবারের সদস্যদের ডায়াবেটিস বা কোলেস্টেরলের পূর্ব ইতিহাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। সন্তান প্রসবের সময় খিঁচুনি রোগের (Eclampsia) কারণে মায়ের রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ: মাথাব্যথা, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা করা উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক লক্ষণ। এছাড়া রোগীর মাথা ঘোরা, ঘাড় ব্যথা করা, বুক ধড়ফড় করা ও দুর্বল বোধ করাও উচ্চরক্তচাপের লক্ষণ। অনেক সময় রোগীর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীর ভালো ঘুম হয় না এবং অল্প

পরিশ্রমে তারা হাঁপিয়ে ওঠে। ভয়ের ব্যাপার হলো, প্রায় 50% ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ হলে কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তখন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

রক্তচাপ নির্ণয় করা: রক্তচাপ মাপক যন্ত্র বা বিপি যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ মাপা হয়। রক্তচাপ মাপার শুরুতে রোগীকে কয়েক মিনিট নিরিবিলা পরিবেশে শান্তভাবে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। কমপক্ষে 15 থেকে 20 মিনিটের ব্যবধান রেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা ভালো।



একক কাজ

কাজ: রক্তচাপ মাপার কৌশল আয়ত্ত করে তোমার বন্ধুদের রক্তচাপ নিচের ছকে উপস্থাপন কর।

শিক্ষার্থীর নাম	রক্তচাপ (সিস্টোল/ডায়াস্টোল)	মন্তব্য

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার: উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকারে টাটকা ফল এবং শাক-সবজি খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখে শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা প্রয়োজন। চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ছাড়াও খাবারের সময় অতিরিক্ত লবণ (কাঁচা লবণ) খাওয়া উচিত নয়। ধূমপান ত্যাগ করা জরুরি। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে, যা স্ট্রোক নামে পরিচিত।

কর্মতৎপরতা, স্বাস্থ্য, বয়স এবং রোগের কারণে মানুষের রক্তচাপের মাত্রা কমবেশি হতে পারে। মোটা লোকদের ওজন কমানো, চর্বিজাতীয় খাদ্য কম খাওয়া, খাবারে কম লবণ দেওয়া ইত্যাদি নিয়ম মেনে চললে উচ্চ রক্তচাপ এড়ানো যায়। রক্তচাপ খুব বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষধ সেবন করা উচিত।

6.4.5 কোলেস্টেরল (Cholesterol)

কোলেস্টেরল হাইড্রোকার্বন কোলেস্টেইন (Cholestane) থেকে উৎপন্ন একটি যৌগ। উচ্চশ্রেণির প্রাণিজ কোষের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোলেস্টেরল লিপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। রক্তে তিন ধরনের লিপোপ্রোটিন দেখা যায়।

(a) LDL (Low Density Lipoprotein): একে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয়, কারণ এটি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। সাধারণত আমাদের রক্তে 70% LDL থাকে। ব্যক্তিবিশেষে এই পরিমাপের পার্থক্য দেখা যায়।

(b) HDL (High Density Lipoprotein): একে সাধারণত ভালো কোলেস্টেরল বলা হয়। এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

(c) ট্রাই-গ্লিসারাইড (Tryglyceride): এই কোলেস্টেরল চর্বি হিসেবে রক্তের প্লাজমায় অবস্থান করে। ট্রাই-গ্লিসারাইড আমাদের খাদ্যের প্রাণিজ চর্বি অথবা কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয়ে থাকে।

নিচের সারণিতে রক্তে কোলেস্টেরলের আদর্শ মান দেখানো হলো।

কোলেস্টেরলে প্রকার	মিলিমোল/লিটার
LDL	< 1.8
HDL	> 1.5
ট্রাই-গ্লিসারাইড	< 1.7

অধিক মাত্রার কোলেস্টেরল উপস্থিত এমন খাদ্যের মধ্যে মাখন, চিংড়ি, বিনুক, গবাদিপশুর যকৃৎ, ডিম, বিশেষ করে ডিমের কুসুম উল্লেখযোগ্য।

রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা: দেহের অন্যান্য অঙ্গের মতো হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন এবং খাদ্যসার সরবরাহের প্রয়োজন হয়। হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনিগাঠে চর্বি জমা হলে ধমনিতে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, ফলে হৃৎপিণ্ড পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং খাদ্যসার না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার কারণে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এ অবস্থাকে অ্যানজিনা (Angina) বলা হয়। এছাড়া ধমনির গায়ে বেশি চর্বি জমা হলে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে করোনারি হৃদরোগের আশঙ্কা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

কোলেস্টেরলের কাজ: উপকারিতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

কোলেস্টেরল কোষপ্রাচীর তৈরি এবং রক্ষার কাজ করে। প্রতিটি কোষের ভেদ্যতা (Permeability) নির্ণয় করে বিভিন্ন দ্রব্যাদি কোষে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। মানবদেহের জনন হরমোন এনড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেন তৈরিতে সাহায্য করে। অ্যাডরেনাল গ্রন্থির হরমোন ও পিত্তরস তৈরিতে কোলেস্টেরলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোলেস্টেরল পিত্ত তৈরি করে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে চামড়ার কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয়, যা রক্তের মাধ্যমে কিডনিতে গিয়ে ভিটামিন 'ডি'র কার্যকর রূপে পরিণত হয় এবং আবার রক্তে ফিরে আসে। কোলেস্টেরল মাত্রা দেহের চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনকে (এ, ডি, ই এবং কে) বিপাকে সহায়তা করে। স্নায়ুকোষের কার্যকারিতার জন্য কোলেস্টেরল প্রয়োজন। দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে কোলেস্টেরল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

গবেষণায় প্রমাণিত যে রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সংবহনের বিশৃঙ্খলার সাথে জড়িত। কোলেস্টেরল পিত্তরসের অন্যতম উপাদান হলেও একটি একটি বর্জ্য পদার্থ এবং যকৃতের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়। পিত্তরসে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা তলানির মতো পিত্তথলিতে জমা হয়। কোলেস্টেরলের এ তলানিই শক্ত হয়ে পিত্তথলির পাথর (Gallbladder stone) নামে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য, কোলেস্টেরল ছাড়াও পিত্ত, ফসফেট, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি জমেও পিত্তথলির পাথর হতে পারে।

6.4.6 অস্থিমজ্জা ও রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা: লিউকেমিয়া (Leukemia)

ভ্রূণ অবস্থায় যকৃৎ এবং প্লীহায় লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়। শিশুদের জন্মের পর থেকে লাল অস্থিমজ্জা হতে লোহিত কণিকা উৎপন্ন শুরু হয়। এগুলো প্রধানত দেহে O_2 সরবরাহের কাজ করে। যদি কোনো কারণে অস্বাভাবিক শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি ঘটে তাহলে রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। তখন অস্থিমজ্জা অত্যধিক হারে শ্বেত রক্তকোষ উৎপাদন করার কারণে পরোক্ষভাবে লোহিত রক্তকোষ এবং অণুচক্রিকার উৎপাদন কমে যেতে পারে। লিউকেমিয়াকে রক্তের ক্যান্সার বলা হলেও এটি আসলে রক্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতাজনিত একটি রোগ এবং এতে প্রধানত যে অজাতি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তা হলো অস্থিমজ্জা। লোহিত রক্তকোষের অভাবে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, যার ফলে রোগী দুর্বল বোধ করে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং শ্বাসকষ্ট হয়। অণুচক্রিকার অভাবে রক্ত জমাট বাঁধতে না পারার কারণে দাঁতের গোড়া ও নাকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক সময় কোনো আঘাত ছাড়াই অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়। একই কারণে দেহ ত্বকে ছোট ছোট লাল বর্ণের দাগ দেখা দিতে পারে এবং পায়ের গিঁটে ব্যথা হয়ে ফুলে উঠতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শ্রেণিবিভাগ অনুসারে অর্ধশতাধিক প্রকারের লিউকেমিয়া আছে, যার বেশির ভাগেই শ্বেত রক্তকোষের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু অধিক হারে শ্বেত রক্তকোষ উৎপন্ন হলেও সেগুলো আসলে ক্যান্সার কোষ এবং শ্বেতকোষের স্বাভাবিক কাজ, রোগ প্রতিরোধে অক্ষম। তাই লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হন। রোগ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতার কারণে দীর্ঘমেয়াদি জ্বর হতে পারে এবং লসিকা গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। এভাবে রক্তের তিন ধরনের কোষের প্রায় প্রতিটিরই স্বাভাবিক কাজ ঠিকমতো না করতে পারা এ রোগের লক্ষণ। তবে লিউকেমিয়ার প্রকারভেদ অনুসারে লক্ষণের তারতম্য হতে পারে।

চিকিৎসা : বর্তমানে প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ নির্ণয় করা গেলে এবং রোগীর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারলে এ রোগ নিরাময় করা সম্ভব। সাধারণত ক্যান্সার কেমোথেরাপি এবং অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়, অবশ্য প্রকারভেদ অনুসারে চিকিৎসার ভিন্নতা রয়েছে। একসময় লিউকেমিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তবে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব এবং দেশের বহু সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ক্যান্সার কেমোথেরাপির ব্যবস্থা আছে।

6.5 রক্ত সংবহনতন্ত্রের কয়েকটি রোগ ও প্রতিকার

(a) হার্ট অ্যাটাক

যখন কারও হৃদযন্ত্রের কোনো অংশে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়, তখন হৃৎপিণ্ডের কোষ কিংবা হৃৎপেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মায়োকারডিয়াল ইনফ্রাকশন, করোনারি থ্রোমবসিস ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে একনামে হার্ট অ্যাটাক নামে ডাকা হয়। বাংলাদেশে হৃদরোগ, বিশেষ করে করোনারি (coronary) হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং খাবারের সারবস্তু অর্থাৎ পুষ্টিকর পদার্থ রক্তনালির মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়। নিজের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য অর্থাৎ তার হৃৎপেশির অক্সিজেন এবং পুষ্টি অর্জনের জন্য হৃৎপিণ্ডের তিনটি প্রধান রক্তনালি আছে। এগুলোর মধ্যে অনেক সময় চর্বি জমে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে প্রাণঘাতী রোগ হার্ট অ্যাটাক হয়। বর্তমান সময়ে হার্ট অ্যাটাকে শুধু 40-60 বছর বয়সী লোকেরাই আক্রান্ত হচ্ছে না, অনেক সময়ে তরুণরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এ রোগের সাথে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন অধিক তেলযুক্ত খাবার (বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি), ফাস্টফুড (বার্গার, বিফ বা চিকেন প্যাটিস ইত্যাদি) খাওয়া, অলস জীবনযাপন এবং শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে এই রোগ দেখা যায়। এ ছাড়াও সব সময় হতাশা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিমর্ষ থাকায় যেকোনো বয়সে এই রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

রোগের লক্ষণসমূহ: হার্ট অ্যাটাক হলে বুকে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়। বিশেষ করে বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয় যা, প্রাথমিকভাবে এন্টাসিড ঔষধ খেলেও কমবে না। ব্যথা বাম দিকে বা সারা বুকে ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যথা অনেক সময় গলা এবং বাম হাতে ছড়িয়ে যায়। রোগী প্রচণ্ডভাবে ঘামতে থাকে এবং বুকে ভারি চাপ অনুভব করছে বলে মত প্রকাশ করে। রোগীর যদি আগে থেকে ডায়াবেটিস থাকে, তাহলে তার বুকে কোনো ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। তাই রোগী কিছু বুঝে ওঠার আগেই সর্বনাশ হয়ে যায়। এজন্য ডায়াবেটিস রোগী কোনো অসুবিধা বোধ না করলেও নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চেক-আপ করাতে হবে।

প্রতিকার: এমন অবস্থা দেখা দিলে অবহেলা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসিজি করিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। করোনারি হৃদরোগ এক মারাত্মক হৃদরোগ। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে কিছু নিয়ম মেনে চলা দরকার, যাতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন: ধূমপান না করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা বা হাঁটা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা, কাঁচা ফল ও শাকসবজি বেশি বেশি খাওয়া। চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া, ভাজা খাবার, মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড না খাওয়া ইত্যাদি।

(b) বাতজ্বর (Rheumatic Fever)

স্ট্রেপটোকক্কাস (streptococcus) অণুজীবের সংক্রমণে সৃষ্ট শ্বাসনালির প্রদাহ, ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর, টনসিলের প্রদাহ অথবা মধ্যকর্ণের সংক্রামক রোগ বাতজ্বরের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সাধারণত শিশুকালেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হয় এবং দেহের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়। হৃৎপিণ্ড যদি এ রোগে পূর্ণভাবে আক্রান্ত নাও হয়, হৃৎপেশি এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা বা ভালভ অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ড যথাযথভাবে রক্ত পাম্প করতে সক্ষম হয় না এবং দেহে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ কমে যায়।

শুরুতেই রোগটি নির্ণীত না হলে বা সঠিক চিকিৎসা না হলে পরে রোগের প্রকোপ বেড়ে গেলে ওজন হ্রাস, রক্তস্বল্পতা, ক্লান্তি, ক্ষুধামান্দ্য, চেহারায়ে ফ্যাকাশে ভাব ইত্যাদি দেখা দেয় এবং রোগের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করার আর উপায় থাকে না। পরবর্তী সময়ে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ফুলে যাওয়া এবং ত্বকে লালচে রঙ দেখা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ শনাক্ত করা গেলে পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ যথাযথভাবে প্রয়োগে এ রোগের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পেনিসিলিন খাবার পরামর্শ দেন।

হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায়:

মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই তার হৃৎপিণ্ড কাজ করা শুরু করে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে। মানুষের বাঁচা-মরায় হৃদযন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার জন্য সঠিক জীবনধারা (lifestyle) এবং খাদ্য নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। নানা ধরনের তেল বা চর্বিজাতীয় খাদ্য হৃদযন্ত্রের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। রক্তের কোলেস্টেরল হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে থাকে।

মাদক সেবন ও নেশা করলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও হ্রাস্পন্দন সাধারণ মান থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদকসেবী কিছুটা মানসিক আনন্দ এবং প্রশান্তি পেলেও তার হৃদযন্ত্রের অনেক ক্ষতি হয়। সিগারেটের তামাক অথবা জর্দার নিকোটিনের বিষক্রিয়া শরীরের অন্য অংশের মতো হৃৎপেশির ক্ষতি করে। সঠিক খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখা যায়। মেদ সৃষ্টিকারী খাদ্য যেমন তেল, চর্বি, অতিরিক্ত শর্করা পরিহার এবং সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ, প্রতিদিন পরিমিত ব্যায়াম এবং হাঁটা-চলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন লাভ করা যায়।

? অনুশীলনী



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. প্রস্বেদন কী?
2. ব্যাপন কাকে বলে?
3. রক্তকণিকা কত প্রকার ও কী কী?
4. ধমনির কাজ কী?
5. রক্তচাপ বলতে কী বোঝায়?



রচনামূলক প্রশ্ন

1. হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার উপায় বর্ণনা কর।
2. চিত্রসহ পানি শোষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. হৃৎপিণ্ডকে আবৃতকারী পর্দার নাম কী?
 ক. এপিকার্ডিয়াম খ. মায়োকার্ডিয়াম
 গ. পেরিকার্ডিয়াম ঘ. এন্ডোকার্ডিয়াম
2. আরাফাত পায়োস খাওয়ার সময় টসটসে কিশমিশ দেখতে পেল। এক্ষেত্রে কিশমিশ টসটসে হওয়ার কারণ কী?
 ক. ব্যাপন খ. শোষণ
 গ. অভিস্রবণ ঘ. ইমবাইবিশন

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং 3 ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাম	রক্তের গ্রুপ
রাফিন	A
তামিম	B
তাসমিয়া	AB
রাতুল	O

3. সর্বজনীন রক্তদাতা বা গ্রহীতার ধারণা যদিও বর্তমানে খুব একটা প্রযোজ্য নয়, তবু উক্ত ধারণা অনুসারে তাত্ত্বিক বিবেচনায় রাফিনের রক্তের প্রয়োজন হলে কার নিকট থেকে রক্ত নিতে পারবে?

- ক. তামিম খ. তাসমিয়া
গ. রাতুল ঘ. তামিম ও রাতুল

4. তাসমিয়া —

- (i) রক্তে A, B অ্যান্টিজেন বহন করে
(ii) রাফিনকে রক্ত দান করতে পারবে
(iii) তামিমের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে

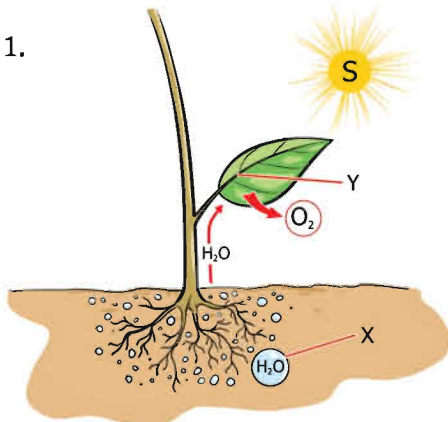
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও ii ঘ) i, ii ও iii



সৃজনশীল প্রশ্ন

1.



ক. বৈষম্যভেদ্য পর্দা কী?

খ. ইমবাইবিশন বলতে কী বুঝ?

গ. চিত্রে S উপাদানটির অনুপস্থিতি প্রক্রিয়াটিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে X উপাদানটি যদি Y অঞ্চলে না পৌঁছায়, তাহলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কী সমস্যা দেখা দিবে বিশ্লেষণ কর।

২. হাসান সাহেবের বয়স ৫০। তিনি একটি আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি মাথাব্যথা, বুক ধড়ফড় এবং অস্থিরতা ভাব অনুভব করছেন। অন্যদিকে তার ৭ বছর বয়সী মেয়ে মূনের গিঁটে ব্যথা, ফুলে যাওয়া, ত্বকে লালচে ভাব দেখা যাচ্ছে। তারা দুজন ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ক. রক্ত কী?

খ. শ্বেতকণিকা কীভাবে দেহকে রক্ষা করে? বুঝিয়ে লেখ।

গ. হাসান সাহেবের সমস্যাগুলোর কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা দুটির মধ্যে কোনটি অনিরাময়যোগ্য যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।